بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৩০ ডিসেম্বর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩০ ডিসেম্বর ২০১১-এর (৩০ ফাতাহ্, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِك يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, সাহাবায়ে কেরামের জামাত কেবল সেটিই নয় যা গত হয়েছে বরং কুরআন শরীফে (সাহাবাদের) আরো একটি দলের কথা উল্লেখ আছে। তাঁরাও সাহাবাদের অন্তর্ভূক্ত যাঁরা হযরত আহমদ বা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতিবিম্ব (আ.)-এর সাথে থাকবেন। মহানবী (সা.)-এর অপর এক নাম আহমদ অর্থাৎ হুযূর (সা.) আর তাঁর প্রতিচ্ছবি হলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)। তিনি বলেন, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (সূরা আল্ জুমুআ: ৪) অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের জামাত কেবল সেটিই নয় যা গত হয়েছে বরং মসীহ মওউদ(আ.)-এর যুগের জামাতও সাহাবা হবেন। সাহাবা বলতে এমন লোকদের বুঝায় যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছেন, তাঁর হাতে বয়আত করেছেন, তাঁর সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন এবং নিজেদের ঈমান ও বিশ্বাসে তাঁরা দৃঢ়তা লাভ করেছেন। তিনি (আ.) বলেছেন, এ দল ও সাহাবায়ে কেরামের জামাত হবে। তিনি আরো বলেছেন, **'এ আয়াত সম্পর্কে তফসীর কারকগণ স্বীকার করেছেন, এখানে 'মিনহুম' শব্দের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত বোঝানো হয়েছে, আধ্যাত্মিক সুশিক্ষা ও কল্যাণের দৃষ্টিকোন থেকে তাঁরা সাহাবা তুল্য হবেন'।**

অতএব ঐসব মানুষ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করেছেন, নিশ্চয়ই তাঁদের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। তাঁদের প্রত্যেকেই আমাদের জন্য আদর্শ। যাদের পুণ্য, খোদাভীতি এবং ব্যবহারিক জীবনে পবিত্র পরিবর্তনের মান নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়। আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মানিত সাহাবাদের জীবনের কতক ঘটনাবলী বা রেওয়ায়েত আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আবার মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের মাধ্যমে তাঁর বৈঠক বা মজলিসে ঘটিত ঘটনার বিবরণ এবং মজলিসের চিত্রও আমাদের সামনে ফুটে উঠে।

আমি মাঝে মাঝে সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত বা ঘটনাবলী উপস্থাপন করে থাকি। আজকেও কিছু রেওয়ায়েত বা ঘটনা উপস্থাপন করব। সেই জ্যোতির কারণে যা তিনি তাঁর মনিব ও অনুসরণযোগ্য নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা খাতামুল আম্বীয়া (সা.)-এর থেকে পেয়েছেন, তিনি সাহাবাদের এমন তরবীয়ত করেছেন যে, তাঁদের প্রত্যেকেই বিস্ময়কর মহিমা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। ধনী হোক বা দরিদ্র, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত প্রত্যেককেই আমরা এক অসাধারণ রঙ্গে রঙ্গীন দেখি। যদি আল্লাহ্‌র সত্তায় নির্ভরশীলতার কথাই ধরা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের কোন জুড়ি নেই; ধর্ম সেবার চেতনা ও প্রেরণাকে নিন, তা ছিল নিঃস্বার্থ ও অনন্য। পবিত্র কুরআন শরীফের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিল সুগভীর, কুরআনের প্রতি তাঁদের ভালবাসা ও প্রেম অসাধারণ। আল্লাহ্‌র স্বয়ং তাদেরকে কুরআন শেখানো, তাঁদের অন্তরাত্মাকে সেই তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করা যা আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁদের গভীর সম্পর্কের পরিচায়ক। এটিও তাঁদের অনন্য বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে অন্যান্য বিষয়ও আছে যাতে তাঁদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার এমন সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় যা কেবলমাত্র নৈকট্য প্রাপ্তদের সাথেই দেখা যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-স্বীয় বৈঠকে বা মাহফিলে কীভাবে তাঁদের সমস্যার সমাধান দিয়েছেন এ সমস্ত রেওয়ায়েত বা ঘটনাবলীর মাধ্যমে তা পরিস্ফুটিত হয়। সংক্ষিপ্ত ছোট্ট বাক্যে কীভাবে তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করা যায় তাও বলেছেন। সংক্ষিপ্ত বাক্যে এমন কৌশল শিখিয়েছেন যদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিকে দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে সহজেই উত্তর প্রদান করা যায়। অতএব এসব মানুষ পরম সৌভাগ্যশালী ছিলেন যাঁরা চৌদ্দশত বছর পরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত দাস এবং নিষ্ঠাবান প্রেমিকের যুগ পেয়েছেন। যেমনটি আমি বলেছি, রেজিষ্টার রেওয়ায়েত বা ঘটনাবলী সম্বলিত খাতা থেকে আমি বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে থাকি আজও কতিপয় রেওয়ায়েত বা ঘটনা বর্ণনা করব।

হযরত মৌলভী সূফী আতা মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি পত্রিকায় পড়েছি, হযরত আকদাস (আ.) জেহলমে আসছেন কিন্তু আমার কোনভাবেই জেহলম যাবার অনুমতি পাওয়া সম্ভব ছিল না। (চাকুরিজীবি ছিলেন) কিন্তু ব্যাকুল ছিলাম, পরিবারের সদস্যদের বললাম আগামীকাল রবিবার, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জেহলম এসেছেন, অফিসের কাউকে বলবেন না— আমি যাচ্ছি। গাড়ি ছাড়ার সামান্য সময় বাকী ছিল মাত্র আর ষ্টেশন ছিল তিন কিলোমিটার দূরে। একে তো পাহাড়ী রাস্তা তার উপর রাতের বেলা। দিনের বেলাতেই লোকদের এ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা ছিল কঠিন। কিন্তু এমন একাগ্রতা ছিল যা তাঁকে রাতে বেরিয়ে পড়তে সাহস যোগায়। তিনি বলেন, খোদার উপর ভরসা করে চলতে থাকি। কাকতালীয়ভাবে সমস্ত রাস্তায় একটি আলো আমার সামনে সামনে চলতে থাকে। হয়ত অন্য কেউ কোথাও যাচ্ছিল। খোদার নাম নিতে নিতে পাহাড়ী রাস্তা দৌড়ে অতিক্রম করি। তিনি বলেন, কোন বাতি আমার সম্মুখে জ্বলছিল, হয়ত কোন ব্যক্তি যাচ্ছিল। যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বের হয়েছেন, তাঁর মসীহ্ ও মাহদীর সাথে সাক্ষাতের জন্য যাচ্ছিলেন তাই আল্লাহ্ তা'লাই ব্যবস্থা করে থাকবেন যে কারণে তাঁর আগে আগে বা সম্মুখে একটি বাতি জ্বলছিল আর তিনি দৌড়ে রাস্তা অতিক্রম করেন। তিনি বলেন, আমি যখন ষ্টেশনে পৌঁছলাম তখন গাড়ী প্রস্থানের জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল। টিকেট নিলাম এবং জেহলম পৌঁছে হুযূর (আ.)-এর সাক্ষাত লাভ করি। সেখানে শেঠ আহমদ দ্বীন নামে একজন ছিলেন তিনি বলেন, প্রকৃত আনন্দ তখন হবে যদি আপনি নযম শুনান। তিনি যখন বয়আত করেছিলেন সেই সময় দোয়া সম্বলিত একটি নযম লিখেছিলেন। তিনি বয়াতের চিঠির সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট তা প্রেরণ করেছিলেন যা একটি দীর্ঘ নযম ছিল। তিনি বলেন, ঠিক আছে যদি

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনুমতি দেন তাহলে আমি শুনাতে পারি। হযরত আকদাস (আ.) অনুমতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি কালক্ষেপণ না করে দাঁড়িয়ে যাই এবং একান্ত আবেগ ও উচ্ছাসের সাথে নযম পাঠ করি। উপস্থিত লোকদের উপর এই নযমের এরূপ প্রভাব পড়েছিল যে কেউ একজন বলেন, আপনি নযমটি আমাকে দিয়ে দিন। আমি বললাম, আমি তো স্মৃতি থেকে পাঠ করেছি। নযম সমাপ্ত করার পরে হুযূর আকদাস (আ.) যে ওযীফার কথা বলেন তা অবিকল পত্রে উল্লিখিত ওযীফা ছিল। অর্থাৎ যখন তিনি বয়আতের জন্য চিঠি এবং এই নযম প্রেরণ করেছিলেন সেই পত্রে এটিও লিখেছিলেন, হুযূর আমাকে কোন ওযীফা বা দোয়া বাতলে দিন যা আমি পালন করবো। তিনি বলেন, মৌখীকভাবে নিবেদনের ফলশ্রুতিতে হুযূর যে-ই ওযীফা বা দোয়ার কথা বললেন তা অবিকল সেই ওযীফাই ছিল যা ইতোপূর্বে লিখে পাঠিয়েছিলেন। এটি দেখে আমি আশ্চর্য হলাম, হুযূরের স্মৃতিশক্তি কত প্রখর। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে যা লিখেছেন এবং পূর্বে মৌখীকভাবে যা বলেছেন তাহলো, আপনি ওযীফার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছেন; পৃথক কোন ওযীফার প্রয়োজন নেই বরং অধিকহারে দরূদ শরীফ ও সূরা ফাতিহা পাঠ করুন। অধিকহারে ইস্তেগফার করুন এবং অত্যন্ত মনযোগ সহকারে নিয়মিত পবিত্র কুরআন পাঠ করুন। এ হচ্ছে সে-ই ওযীফা যা সফলতার চাবিকাঠি।

অনেকে আমাকেও ওযীফার ব্যাপারে পত্র লিখেন– সাধারণত তাদের সবাইকে আমি এ নির্দশনার কথাই স্মরণ করিয়ে থাকি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে এটিও লিখেছেন, **'লা হাওলা'**ও পাঠ করুন **অর্থাৎ "লা হাওলা ওয়ালা কুওঁওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিউল আযীম"**। এটিই হচ্ছে পদ্ধতি, যারফলে মানুষ খোদার নৈকট্য লাভ করে।

আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন জম্মু নিবাসী হযরত খলীফা নূর উদ্দিন (রা.) সাহেব। কেউ যেন ভুল বশতঃ এটি মনে না করেন যে, ইনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বরং ইনি অন্য আরেকজন সাহাবী।

তিনি বলেন, একদা আমি পায়ে হেটে গুজরাতের রাস্তায় কাশ্মীর গিয়েছি। পথিমধ্যে গুজরাতের নিকট একটি জঙ্গলে নামায পড়ে **"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হুযনে"** দোয়াটি সকাতরে পাঠ করি। এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমার জীবিকার এমন ব্যবস্থা করে দিলেন যে, কোন বৈষয়িক কাজকর্ম না করা সত্ত্বেও অদৃশ্য থেকে হাজার হাজার রূপী আমার নিকট আসে। বয়আতের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র করণ শক্তির মাধ্যমে এমন বিপ্লব তাঁদের মাঝে সাধিত হয়েছে যে, দোয়া করতেন আর আল্লাহ্ তা'লা আশ্চর্যজনক ভাবে দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন দেখাতেন। তিনি এ ভাবে দোয়া করতেন, কখনো যেন আমাকে কারো কাছে হাত পাততে না হয়, কখনো দুঃখ-কষ্ট যেন আমাকে ক্লিষ্ট না করে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার কখনো অর্থনৈতিক অচ্ছলতা আসে নি।

এরপর মিঞা শরাফত আহমদ সাহেব তার পিতা মরহুম হযরত মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেব (রা.)-এর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন,

মৌলভী সাহেব আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল একজন মানুষ ছিলেন। তিনি বলতেন, আমাদের যা কিছুরই প্রয়োজন হতো খোদা তা'লা স্বয়ং তার ব্যবস্থা করে দিতেন। অদ্ভুত নির্ভরশীলতা বা তাওয়াক্কুল! আমাদের কাউকে বলার প্রয়োজন পড়ে না, কখনো কাউকে কিছু বলতে হয়নি। তিনি বলতেন, ১৯১৮ অথবা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে আঞ্জুমান আমাকে কর্মচারী নিয়োগ করেছিল আর ২০/২৫ রূপী ভাতা নির্ধারণ করেছিল। সে দিনগুলোতে চাল-ডাল বা খাদ্যশস্যের মূল্য ছিল অনেক

বেশি। নাযের বাইতুল মাল মুন্সী ফরযন্দ আলী খাঁন সাহেব ফিরোজপুরে ছিলেন। পিতাজী তাঁর অধিনস্ত ছিলেন। ফরযন্দ আলী খাঁন সাহেব মৌলভী জালাল উদ্দিন সাহেবকে বলেন, আপনি বেতন পান এ কারণে অনেক পরিশ্রমের সাথে কাজ করেন। আব্বা বলতেন, একথা আমার ভাল লাগল না তাই আমি বলে দিলাম, আমি কি আপনার কাছে বেতন চেয়েছিলাম? আমি ধর্মের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি, যে ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছে সেটি জামাত করেছে, আমি চাইনি, আমার কোন দাবী নেই। মৌলভী সাহেব বলেন, আমি নাযের বাইতুল মালকে বলি, আমি এ ভাতা আর গ্রহণ করবো না। তখন খাঁন সাহেব নাযের বাইতুল মাল বললেন, কাজ পূর্বের ন্যায় করবে নাকি নিজের ইচ্ছা মত করবে? অর্থাৎ বেতন নিবে না বুঝলাম কিন্তু কাজ পূর্বের মতই পরিশ্রমের সাথে করবে কি? তখন মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেব বলেন, পূর্বের চেয়েও বেশী পরিশ্রম এবং পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কাজ করবো। কাজ ও আনুগত্যের সাথে বেতনের কোন সম্পর্ক নেই। বেতন পেলেও আমি ধর্মের সেবা করবো আর না পেলেও। ইনি (তার ছেলে) বলেন, এ কথা বলে তিনি তবলীগী সফরে বেরিয়ে যান। পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, সে সময় বাহন ছিল না, মুবাল্লেগগণ তবলীগী সফরে সাধারণত পায়ে হেঁটেই যেতেন। পথিমধ্যে এ চিন্তার উদয় হলো, যে ভাতা পেতাম তা দিয়ে কোন না কোনভাবে চলে যেতো, চাহিদা পুরণ হতো। হৃদয়ে এই ধারণা জাগে যে, বর্তমান অবস্থা অসচ্ছল, গম ইত্যাদির বাজার অত্যন্ত চড়া, তাই এখন চলবে কি করে? লক্ষ করুন! এমন ভাবনা উদয় হতেই আল্লাহ্ তাঁর সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন। ছেলে বলেন, পিতাজী বর্ণনা করতেন, আমি এ চিন্তা মাথায় নিয়ে পথ চলছিলাম হঠাৎ একটি গর্জনের ন্যায় শব্দ হল, হঠাৎ এক ভীতিপ্রদ গর্জনধ্বনি শুনলাম যারফলে আমার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হলো। ধ্বনিতে একটি বাণী ছিল অর্থাৎ গুরুগম্ভীর স্বরে বলা হয়, আজ পর্যন্ত কেউ কি তোমাকে বেতন বা মাসোহারা দিয়েছে? তুমি কি বেতন বা মাসোহারা খেয়ে এত বড় হয়েছো? অর্থাৎ এতদিন কেটে গেছে তোমার জীবনের; মাসোহারা খেয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছেছ কি? তিনি বলেন, সেই ভীতিপ্রদ ধ্বনির গর্জন আমার কানে পড়তেই আমার সকল দুঃশ্চিন্তা নিমিষে উবে যায়, আর আমি একান্ত মিনতির সাথে নিবেদন করলাম, 'হে আমার আল্লাহ্, তাদের মাসোহারার আমার কী-ইবা প্রয়োজন? তোমার মোকাবিলায় এর গুরুত্বই বা কী', এরপর থেকে আমার সময় পূর্বের চেয়ে ভালো কাটতে লাগলো। তিনি বলেন, তারপর থেকে আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে আমায় সাহায্য করেছেন, পূর্বের তুলনায় আমার অবস্থা আরো ভালো হয়ে যায়। তিনি বলেন (পুত্র) মৌলভী সাহেব (পিতা) বর্ণনা করতেন, খাঁন সাহেব আমার পুরনো বন্ধু ছিলেন আর এই শব্দ কথার ছলে বা হাসি-তামাসায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে যায় যা পরবর্তিতে মাসোহারারূপী শির্ক এর অপনোদনের কারণ হয়।

পুনরায় হযরত মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেব মরহুমের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন, তিনি অর্থাৎ মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেব স্বপ্নে দেখেন, হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব জুয়া খেলছেন আর তিনি (মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেব) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খিদমতে তা উল্লেখ করেন। তিনি (আ.) বলেন, **'মৌলভী সাহেব অর্থাৎ মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেব! মৌলভী সাহেব (অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হযরত মওলানা নূর উদ্দীন সাহেব) তো জুয়াই খেলেন কিন্তু তা খোদার সাথে। জুয়াড়ীরা যেভাবে খেলার সময় সবকিছু বাজী রেখে খেলে— নিজেদের কাছে কিছুই রাখে না, একইভাবে মৌলভী সাহেবও সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় উৎসর্গ করেন'**। এই দুই বাক্যের কোন একটি তিনি বলেছেন। অর্থাৎ এটি একটি ব্যবসা যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) করতেন, আর দুনিয়ার কীটরা বস্তু স্বার্থে জুয়ার পিছনে পুরো

সম্পদকে হুমকি-গ্রস্ত করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে বলেন, তিনি নিজের ইহ ও পরকাল উভয়ের নিশ্চয়ার্থে নিজের সকল ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করেন। যেভাবে আমরা জানি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর জীবনের ঘটনাবলী অগণিত। কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জাগতিক সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং যথাযথভাবে পূরণ করেছেন, আর ধর্মের ক্ষেত্রেও যে মর্যাদা তিনি লাভ করেছেন তা সবারই জানা।

মিঞা ওলী মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র হযরত সুফী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব বলেন, ১৯১২ সালে আমি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ করি, তারপর আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি, কুরআন শরীফ মুখস্থ করবো নাকি এম.এ পরীক্ষা দেবো? তিনি বলেন, কুরআন করীম মুখস্থ করো, এম.এ আবার কী? আমি ছয় মাসের মধ্যে কুরআন করীম মুখস্থ করে ব্যাপারটি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা)-কে জানাই তখন তিনি কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করেন। এ ছিল সাহাবাদের শিক্ষার মান, এই ছিল তাঁদের আনুগত্য, এ ছিল পবিত্র কুরআনের প্রতি তাদের ঐকান্তিক ভালবাসা। বস্তুজগতকে উপেক্ষা করে সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ মুখস্থ করেছেন তারপর অন্য পড়াশুনা করেছেন।

পরবর্তী ঘটনা বা রেওয়ায়েত হযরত সৈয়দ আখতার উদ্দীন আহমদ সাহেব (রা.)-এর। তিনি লিখেন, বন্ধুর স্মরণ বন্ধুর সাক্ষাতের চেয়ে কম নয়, প্রেমিকের হৃদয় প্রেমাস্পদকে স্মরণ ও তার উল্লেখের অধীর আগ্রহ রাখে তাই এটি কি করে হতে পারে যে, রহমান ও রহীম খোদার প্রেরিত রসূল— নবীদের সর্দার এবং আমাদের মনিব, প্রেমাস্পদ ও অনুসরণযোগ্য নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মূর্ত প্রতিচ্ছবি, আহমদ রূপের বিকাশস্থল, আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুসরযোগ্য নবী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্মরণের ব্যাকুলতা রাখবে না বা তাঁর স্মরণে আনন্দ পাবে না। কিন্তু আমার ভয় ছিল এই অধমের স্মৃতিশক্তি দুর্বল আর হুযুর (আ.)-এর পবিত্র সাহচর্য বন্ধ হওয়ার পর এক দীর্ঘকাল কেটে গেছে। অর্থাৎ ১৯০২ সালের শেষ হতে ১৯০৩ এর শেষ অবধি প্রায় এক বছর পর্যন্ত সে সুযোগ হয়। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর। সেই সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কটক নিবাসী অতিথি কেবল আমরা দু'জনই ছিলাম অর্থাৎ এ অধম ও অধমের মামা মরহুম মৌলভী সৈয়দ আহমদ হোসেন সাহেব। শুধু আমাদের দু'জনের জন্য কয়েক মাস পর্যন্ত বিশেষভাবে ভাতের ব্যবস্থা করা হতো। এর কারণ, তারা ভাতে অভ্যস্ত ছিলেন আর খুব সম্ভব তারা উড়িষ্যার কোন অঞ্চল থেকে এসে থাকবেন। ভাত তো দেওয়াই হতো তথাপি মিঞা নাজমুদ্দীন সাহেবকে হুযূর (আ.) খুব ভালোভাবে আতিথেয়তার তাগিদ করতেন। যেভাবে মরহুম নাজমুদ্দীন সাহেব আমাদের দু'জনকে বলতেন, তোমাদের ব্যাপারে হুযূর (আ.)-এর পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে।

পুনরায় সৈয়দ আখতার উদ্দীন সাহেবই বলেছেন, আমি ছাত্র ছিলাম এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর দরসে যোগ দিতাম। তিনি অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ অধমকে খুবই স্নেহ করতেন। শ্রদ্ধেয় পিতা (রা.) ও শ্রদ্ধেয়া মরহুমা মাতা رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {অর্থাৎ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাঁদের দু'জনের প্রতি ঠিক সেভাবেই দয়া কর যেভাবে তারা শৈশবে আমায় প্রতিপালন করেছেন} আমাকে যখন বাড়ি ফেরার আদেশ দিলেন তখন অধমের এই কথার প্রেক্ষিতে যে, 'যাতায়াতের খরচ অনেক বেশি কাজেই দারুল আমানে ফিরে আসাটা কঠিন হবে'- হুযূর (রা.) বললেন, 'আসার আগে আমাকে বলবে আমি তোমার পথ খরচ পাঠিয়ে দিব।' আমার পিতা-মাতা আমাকে বাড়ি ফিরে আসতে বললে আমি

যখন বাড়ি যেতে চাইলাম তখন খলীফতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে জানালাম, যেহেতু খরচ অনেক বেশি তাই কাদিয়ান ফিরে আসা আমার জন্য কঠিন হবে। যখন এ অধমের বাড়ি ফিরে আসার সময় ঘনিয়ে এলো তখন ছোট্ট মসজিদ অর্থাৎ মসজিদ মুবারকের উপরের অংশে নামায পড়া হতো। তিনি (রা.) পূর্ব পার্শ্বের নিচ থেকে তাঁর পবিত্র হাতখানা এ অধমের কাঁধে রেখে স্নেহের সাথে বললেন, 'আখতার উদ্দীন! আমি শুনলাম তুমি নাকি অনেক শিক্ষকের কাছে কুরআন পড়'? তিনি বলেছেন, তখন আমি বেশ কয়েকজন শিক্ষকের কাছে কুরআন পড়তাম। وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (আ.) তাকে বললেন, তাক্বওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমায় শিখাবেন। অতএব এটিই হল পবিত্র কুরআন বুঝে-শুনে পড়ার মৌলিক শর্ত। সাহাবাদের মাঝে কুরআন পাঠের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। তাঁরা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মানসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছেও পড়তেন এবং অন্য শিক্ষকদের কাছেও পড়তেন আর বড় কথা হলো, মুত্তাকীদের আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআন করীম পড়ান এবং দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। আর একইভাবে আমরা সাহাবীদের জীবনে দেখতে পাই, তাঁরা পবিত্র কুরআনের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান রাখতেন, মাশাআল্লাহ্।

মুস্তাকীম সাহেবের পুত্র হযরত খায়ের দ্বীন সাহেবের আরেকটি রেওয়ায়েত বা ঘটনা রয়েছে, তিনি বলেন ১৯০৬ সালে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন এবং একই বছর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বলেন, একদিন মাগরীবের নামাযের পর হুযূর বসেছিলেন, কোন কারণ বশতঃ মসজিদে সেদিন আলো ছিল না। অন্যান্য লোকদের সাথে এ অধমও হুযূর (আ.)-এর পাশে বসেছিলাম। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর! মৌলভীরা বলে, অর্থাৎ অ-আহমদী মৌলভীরা বলে, হযরত মসীহ্ নাসেরী অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) জীবজন্তু বানাতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, শেখ সাহেব! আল্লাহ্ স্রষ্টা তাহলে মসীহ্ও কি স্রষ্টা? শুধু একটি বাক্যই বলেছেন। বর্ণনাকারী লিখেন, অন্ধকার হেতু আমি বুঝতে পারি নি শেখ সাহেব কে ছিলেন; কিন্তু শেখ সাহেব আর কিছুই বলেন নি।

পুনরায় হুযূর নিজেই বলেছেন, বিতর্কে আমাদের মৌলভীদের এমন ছোট-ছোট বাক্য ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ তিনি বলেন, মসীহ্ পাখি ও জীব-জন্তু বানাতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তরে বললেন, আশ্চর্যের বিষয়! খোদাও স্রষ্টা (স্রষ্টা হওয়া খোদার বিশেষত্ব বা গুণ) আর মসীহ্ও স্রষ্টা? তোমরা মুসলমান হয়েও এতবড় শির্ক'এ লিপ্ত? এরপর তিনি বলেন, এই সামান্য ছোট্ট বাক্য কখনো কখনো তবলীগের সময় অনেক কাজে আসে কেননা, দীর্ঘ আলোচনায় গেলে বিষয় এলোমেলো হয়ে যায়। হযরত খায়ের দ্বীন সাহেব লিখেন, এরপর আমি আমার গ্রামে ফিরে যাই। কুরআন শরীফ পড়ার প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। আমাকে একদিন স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, তুমি কাদিয়ানে চলে আস আমি তোমাকে কুরআন শরীফ পড়িয়ে দিব। তিনি এ স্বপ্ন দেখেছিলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর। তিনি বলেন, এরপর আমি আরেকটি স্বপ্ন দেখি আর তাহলো, আমি কাদিয়ানে হিজরত করি আর সেই স্থানে এসেছি যেখানে এখন নাসেরাবাদ মহল্লা অবস্থিত। সেখানে আমি আমার জিনিসপত্র নামাচ্ছি এবং জিজ্ঞেস করলাম এই জায়গার নাম কি? তখন আকাশ থেকে বিশেষ আকৃতি ধারণ করে একটি শব্দ আসছিল যেন সেটি কোন ভৌত বস্তু জাতীয় কিছু, যার আকার-আকৃতি অনেকটা ফুটবল-সদৃশ। এর ভেতর থেকে আওয়াজ আসছিল, যেখানে তুমি তোমার জিনিসপত্র নামাচ্ছ এ স্থানের নাম হলো, ইব্রাহীমি জঙ্গল। মনে হলো যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হযরত সাহেবের নাম ইব্রাহীম বলছেন। তখন

আমার জানা ছিল না হযরত সাহেব বলেছেন, **‘আমি কখনো আদম কখনো মূসা কখনো ইয়াকুব আবার কখনো ইব্রাহীম আর আমার অসংখ্য বংশধর রয়েছে’।**

তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা’লা আমাকে ডেকে এই তথ্য অবহিত করেন আর তখন আমি বুঝতে পেরেছি এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথার, নামের এবং বিভিন্ন ইলহামের সত্যায়ন আল্লাহ্ তা’লা তাঁর সাহাবীগণের মাধ্যমে করতেন।

এরপর খায়ের দ্বীন সাহেব আরো বলেন, আমি বিনয় বশতঃ বলছি না বরং সত্যিকার অর্থেই আমি পাপি ছিলাম। এখন আমি যা বর্ণনা করতে যাচ্ছি তা অবশ্য নবুওয়তের জ্যোতির কল্যাণেই হবে আমার বাহুবলে নয়। কেননা তিনি বলেছেন, **‘আমি-ই খোদার সেই জ্যোতি যার মাধ্যমে হলো দিন জ্যোতির্ময়’।**

মোটকথা এটি নিশ্চিত বিষয়, যে আলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে সে আলো হতে অবশ্যই অংশ লাভ করবে। হ্যাঁ এ বিষয়টিও অত্যন্ত স্পষ্ট, সেই আলো সকলেই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে লাভ করে। হযরত খায়ের দ্বীন সাহেব বলেন, আমরা এটি জানতামই না ইলহাম কাকে বলে। কাশ্ফ কি জিনিস আর সত্য স্বপ্ন কাকে বলে। এখন আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় খোদার এই প্রত্যাদিষ্টের হাতে হাত দেয়ার কল্যাণে শুধু ইলহাম, কাশ্ফ এবং সত্য স্বপ্নের জ্ঞানই লাভ হয়নি বরং এ তিনটিই আমি নিজের জীবনে বাস্তবায়িত হতে দেখেছি।

খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এ সম্পর্কে কয়েকবার আমরা শুনেছি, যখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো হযরত মৌলভী সাহেব, আপনি তো পূর্বেই বড় বুযূর্গ ছিলেন। আপনি হযরত মির্যা সাহেবের হাতে বয়আত করে কি পেয়েছেন? হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) উত্তরে বলেন, **‘অনেক লাভ হয়েছে। কেবল একটা লাভের কথাই তোমাকে বলছি- পূর্বে আমি মহানবী (সা.)-এর দর্শন পেতাম স্বপ্নে, আর এখন চোখ খোলা আর জাগ্রত অবস্থায় এবং কাশ্ফের মাধ্যমে পাই। এটি সেই বিপ্লব যা আমার মাঝে মির্যা সাহেব সৃষ্টি করেছেন’।**

হযরত খায়ের দ্বীন সাহেব লিখেছেন, এখন আমরা অভিজ্ঞতালব্ধ নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে এসব কথার যথার্থতা বর্ণনা করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, সম্ভবত যোহরের সময় ছিল, একদিন আমি মসজিদে মোবারকে বসা ছিলাম, এই ইলহাম লাভ করলাম, ‘উলাইকা হুমুল মুফলিহুন’ অর্থাৎ এরাই হলো সফলকাম। এতে এটা বলা হয়েছে, এই জামাতের লোকেরাই সফলতা লাভ করবে। অতএব আমরা দেখছি, যারা নগণ্য মানুষ তাদেরও শেষ পরিণতি ভাল হচ্ছে। আর তারা অনেক ভাল ভাল কাজ করছে। তাদের দোয়ায় এক বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একবার আমি দোয়া করেছি, ‘হে আল্লাহ্! তোমার নৈকট্য লাভের জন্য কোন্ পথ সর্বোত্তম। তখন খাকসারকে (এই লোকদেরকে দেখুন, তাদের ইচ্ছা আকাঙ্খা কেমন ছিল, আল্লাহ্র সাথে কীরূপ সম্পর্ক ছিল আর সম্পর্ককে দৃঢ় করার জন্য কেমন ব্যাকুলতা ছিল। দোয়া করছেন, আল্লাহ্ তোমার নৈকট্য লাভের উপায় কি) আল্লাহ্ তা’লা উত্তর দিলেন, আমাদের নৈকট্য অর্জনের দু’টি পথ। চাঁদা দাও অথবা তবলীগ করো। এ দু’টি পথ আমাদের পছন্দ। আমি নিবেদন করলাম হে আল্লাহ্! আমি তো এতটা পড়াশুনা জানি না। (আল্লাহ্ তা’লার সাথে তার সংলাপ চলছে)। আমি তবলীগ কীভাবে করবো? আল্লাহ্ তা’লা আবার স্বপ্নে বললেন, আমরা তো তোমাকে কুরআন শরীফ পড়িয়ে দিয়েছে। যখন এ বাক্যটি খোদা তা’লা বললেন, তখন আমি وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى আয়াতের সমাধান পেলাম। অর্থাৎ যখন তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছ তুমি নও বরং খোদা তা’লা মেরেছেন,

এটি মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বদরের যুদ্ধের সময় বলা হয়েছে। যে মুষ্টি তখন ধুলিঝড় বা তুফান বয়ে এনেছিল। তিনি বলেন, খোদার শিখানোর কারণে এই আয়াত বুঝতে যে সমস্যা ছিল তার সমাধান হলো। যখন আমি নিজের গ্রামে ছিলাম, তখন স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। এর কথা প্রথম স্বপ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনি বলেছিলেন, তুমি কাদিয়ানে এসে যাও, আমরা তোমাকে কুরআন শরীফ পড়াবো। এখন দেখুন! প্রতিশ্রুতি তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দিয়েছিলেন, আর উত্তর আল্লাহ্ তা'লা দিচ্ছেন আর বলেন, আমরা তোমাকে কুরআন শরীফ পড়িয়ে দিয়েছি। অধম মনে করে আমি আমার সামান্য যোগ্যতানুসারে আজ খোদার কৃপায় যে কুরআন পড়তে চায় তাকে পড়াতে পারবো। আজকাল অতিথি শালায় আমি সকালে ঘন্টা দেড় ঘন্টা কুরআন শরীফ অনুবাদসহ পড়াচ্ছি। যখন খোদা তা'লা এ কথা বলেছিলেন, আমরা তোমাকে কুরআন শরীফ পড়িয়ে দিয়েছি, তখন সাথে সাথে এটিও বলেছেন, তুমি কি আদ ও সামুদ জাতির কাহিনী কুরআনে পড় নি? এক রুকু পড়ি আর লোকদের শুনিয়ে দেই যে, নবীদের অবাধ্যদের কি পরিণাম হয়ে থাকে? এভাবে দোয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি ঘি বেশি করে খাও। আমি নিবেদন করলাম, ঘি খাওয়ার অর্থ কি? আল্লাহ্ তা'লা তৃতীয় দিন উত্তর দিলেন, ঘি খাওয়ার অর্থ হলো, অধিক হারে দোয়া করা। এ বাক্যটি পাঞ্জাবী ভাষায় বলেন, **'যে ঘরে দোয়া করা হয় সে ঘর হাসি আনন্দে মুখর থাকে'**। আবার এই ধ্বনিও শুনতে পাই, **'যার সাথে খোদা তা'লা বাক্যালাপ করেন না সে মুসলমান নয়'**। কাজেই আমরাও যদি সুখে থাকতে চাই তাহলে আমাদের ঘরগুলোকে দোয়া দ্বারা পরিপূর্ণ করতে হবে। তিনি বলেন, আমার মত মানুষ এ দাবী করতে পারে কি যে, এটি আমার শক্তিবলে হয়েছে। বরং সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে, এটি নবুয়তের জ্যোতি থেকে প্রাপ্ত। কাজেই আমি হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাক্যই পুনরাবৃত্তি করছি। তিনি বলেন,

'আমি সেই পানি যা আকাশ থেকে সময় মত অবতীর্ণ হয়েছে,
আমি-ই খোদার সেই জ্যোতি যার মাধ্যমে দিন হলো আলোকিত'।

অতঃপর ফয়েজউল্লাহ্ চক নিবাসী হযরত হাফিয নবী বখ্শ সাহেব, পিতা: হাফিয করীম বখ্শ সাহেব বলেন, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দর্শন লাভ করেন এবং বয়আতও প্রাথমিক যুগেই করেন। হাফিয সাহেবের পুত্র আফ্রিকার মুবাল্লেগ হাকীম ফজলুর রহমান সাহেব লিখেন, তাঁর হৃদয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসা বিদ্যমান রয়েছে আর স্বভাবগতভাবে তিনি এতটাই সচেতন ছিলেন যে, যখন কেউ হুযূর (আ.) সম্পর্কে জানতে চাইতেন তিনি এই উত্তর-ই দিতেন, নিজের স্মরণশক্তির উপর আমার আস্থা নাই। এমন যেন না হয় যে হুযূরের ব্যাপারে কোন ভুল কথা বলে বসি। তিনি কৃষি ও সেচ বিভাগের পাটওয়ারী ছিলেন এবং ভূমি জরিপের দিনগুলিতে প্রায় সারা দিন তাঁকে মাঠেঘাটে ঘুরতে হতো এমনকি জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসেও অর্থাৎ মে-জুনের মতো প্রচন্ড গরমের মাসগুলোতেও ঘুরে বেড়াতে হতো আর এরফলে মানুষ যে কতটা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয় তা জানা কথা। কিন্তু তিনি রাতের বেলা অবশ্যই তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন এবং আমাদেরকে তথা নিজের সন্তানদেরকেও তাগিদ দিতেন। রোযার দিনগুলোতে অত্যধিক গরম হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন। শীতকালে তাহাজ্জুদ নামাযে সাধারণত উঁচুস্বরে তিলাওয়াত করে সন্তানদেরকেও শামিল করতেন। খোদা তা'লার কৃপায় তিনি কুরআনের হাফিয ছিলেন। আমাদেরকে নামায রোযার জন্য অনেক তাগাদা দিতেন বরং কঠোর নিগরানী করতেন। আর এটিই পিতা-মাতার কাজ। অলসতার কারণে

তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। তিনি স্বয়ং আমাদেরকে পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন। কর্ম ব্যস্ততার কারণে দিনের বেলা সময় না পেলে রাতে পড়াতেন। আমরা তিন ভাই ছিলাম। আমাদের সবার বড় আব্দুর রহমান (রা.) কাদিয়ানে অধ্যয়নকালে সম্ভবতঃ ১৯০৭ সালে মারা যান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বারাহীনে আহমদীয়া প্রণয়ন করছিলেন তখন আমার পিতা আমাকে এবং স্নেহের হাবিবুর রহমান, বি,এ'কে সহ যখন তার বয়স ১২-১৩ বছর ছিল, ফয়জুল্লাহ্ চক গ্রামের হাফিয নূর মোহাম্মদ সাহেব এবং মরহুম হাফিয হামেদ আলী সাহেব (রা.)'র সাথে প্রথমবার হুযূর (আ.)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং এরপর তিনি প্রায়-ই যেতেন আর অতি অল্প দিনের মধ্যেই বয়আতও করে ফেলেছিলেন। কেননা তিনি অর্থাৎ হাকীম ফজলুর রহমানের পিতা হাফিয নবী বখশ সাহেব হুযূর (আ.)-এর দাবীর পূর্বেই তাঁর কাছে বয়আত গ্রহণের অনুরোধ করতেন। প্রথম সাক্ষাত ও বয়আতের সঠিক সন-তারিখ আমার মনে নেই। কিন্তু তিনি হুযূরের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই হুযূরের হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আরো লিখেন, আমাকে কাদিয়ানেই লেখা-পড়া করিয়েছেন অর্থাৎ তাঁর ছেলে হাকীম ফজলুর রহমান সাহেবকে তিনি কাদিয়ানেই লেখা-পড়া করিয়েছেন। দুঃখ-কষ্টে তিনি খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকার উত্তম আদর্শ স্থাপন করেতেন। হাকীম সাহেব লিখেন, যখন ১৯০৭ সালে আমার বড় ভাই-এর মৃত্যু হয় তখন আমাদের বড় দু'বোনের বিবাহের দিন নিকটবর্তী ছিল। আর তাই আমরা পিতার কর্মস্থল থেকে আমাদের জন্মস্থল ফয়জুল্লাহ্ চকে গিয়েছিলাম। জলন্ধর জেলার রাঁও থেকে এক বোনের বিয়ের বারাত এসেছিল। বরযাত্রী আসার তিন দিন পূর্বে কাদিয়ানে তার ভাই আব্দুর রহমান সাহেব যকৃতের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। এ প্রেক্ষিতে রাঁও থেকে তারবার্তা আসে, এই মৃত্যুর কারণে বরপক্ষ বিয়ের তারিখ কিছুটা পিছিয়ে দিতে চায়। তারা নিজ থেকেই এ প্রস্তাব রাখে। কিন্তু হাকীম সাহেবের পিতা বলেন, ঐশী সিদ্ধান্ত অনুসারে এ মৃত্যু নির্ধারিত ছিল, তাই হয়েছে। আপনারা নির্ধারিত সময় বরযাত্রী নিয়ে আসুন এবং মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যান। তিনি তাঁর প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে তাঁর দু'মেয়ের বিয়ে দেন যা একজন ধর্মভীরু মানুষের জন্য মস্ত বড় পরীক্ষা ছিল। এরপর লিখেন, খোদার কৃপায় প্রথম ও দ্বিতীয় খিলাফতের সময় তাঁকে আর কোন পরীক্ষা বা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি আর তিনি এই দুই খলীফার হাতে বয়আত করতেও কোনরূপ ইতস্তত করেন নি। তিনি খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের অতি উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমি তবলীগের জন্য দু'বার পশ্চিম আফ্রিকায় এসেছি। (হযরত হাকীম ফজলুর রহমান সাহেব দীর্ঘদিন পশ্চিম আফ্রিকায় মুবাল্লেগ ছিলেন) প্রথমবার লাগাতার আট বছর অবস্থান করি এবং এখনো সাত বছর পার হয়ে গেছে। তিনি বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখী হন আর পার্থিব দৃষ্টিকোন থেকে আমার উপস্থিতি তাঁর জন্য অনেক বড় সাহায্যের কারণ হতে পারত কিন্তু তিনি সর্বদা আমাকে এ উপদেশই দিয়েছেন, আমি যেন কখনো অধৈর্য না হই এবং কেবল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ ফেরত আসার নির্দেশ দিলেই যেন আমি ফিরে আসি। (অর্থাৎ নিজ থেকে কিছু বলবে না, কিছু দাবী করবে না)।

চাকুরীরত অবস্থায় তিনি জামাতের সকল পত্র-পত্রিকা ক্রয় করতেন এবং নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করতেন। দরিদ্রদের অনেক সাহায্য করেছেন। আতিথেয়তা ছিল তাঁর অত্যন্ত উন্নত মানের। তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন এবং চাকরীকালীন সময় যথারীতি হিস্যায়ে আমদ আদায় করতেন। ফয়জুল্লাহ্ চকে তাঁর যতটুকু জমি ছিল তিনি তার এক দশমাংশের ওসীয়্যত করেন এবং এ জমি আঞ্জুমানের নামে দিয়ে দেন। যাহোক, তাদের অবস্থা লিখেছেন। আমি যে সাহাবীর বিবরণ

দিচ্ছি তাঁর প্রপৌত্র এবং মালেক আব্দুর রহীম সাহেবের ছেলে স্নেহের উমায়েরকে আল্লাহ্ তা'লা ২৮ মে মডেল টাউনের মসজিদে শাহাদতেরও মর্যাদা দান করেছেন। তাঁরও ছোট ছোট দু'টি সন্তান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিরাপত্তা বিধান করুন এবং সাহায্যকারী হোন। সকল যুবক শহীদের বিধবা স্ত্রী-সন্তান ও তাঁদের পিতা-মাতার জন্যও দোয়া করা প্রয়োজন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলের রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দিন। আর শহীদগণের যুবতী স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা ভাল সম্বন্ধের ব্যবস্থা করুন।

মিয়া সিরাজ দ্বীন সাহেবের ছেলে হযরত মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব, যিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দর্শন লাভ করেন, লিখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাচ্চাদেরকে তাঁর ভালোবাসার ক্রোড়ে ঠাঁই দিতেন। অধম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোলে খেলা করতাম। হুযুরের পবিত্র চেহারা ছিল নূরুন আলা নূর (অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিগত জ্যোতির সাথে স্বর্গীয় জ্যোতি একাকার হয়ে গেছে)। শৈশবে মনে হত আপন পিতা-মাতার চাইতেও তিনি আমাদের বেশি ভালবাসতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখনই লাহোর যেতেন, আমাদের বাসস্থানে পদধূলি দিয়ে আমাদের ধন্য করতেন। একবার রীতি অনুযায়ী তিনি ভ্রমনে যান, তিনি (ঘেরা দেয়া) ঘোড়ার গাড়ীতে ভ্রমনে যেতেন। যখন ফেরার সময় হয়, আমাদের বংশের বুযূর্গ পিতা মরহুম সিরাজ দ্বীন সাহেব এবং মিয়া মিরাজ দ্বীন সাহেব ওমরের চাচা এবং মিয়া তাজ দ্বীন সাহেব ও পরিবারের অন্য সদস্যরা হুযূরের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। আমাদের ঘরের সামনে সরকারী বাগান ছিল। বাগান সংলগ্ন সড়কের উপর আমাদের বাসস্থান ছিল। সেখানে মুচি গেট এবং ভাটি গেটের দুষ্ট লোকদের আড্ডা ছিল। যখন হুযূর (আ.)-এর শুভাগমন হল— তিনি (আ.) সিঁড়ি অতিক্রম করে ঘরে প্রবেশ করলেন আর দুষ্টরা পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। তখন আমার মরহুম পিতা এবং আমার চাচা সাহেব এর প্রতিকার সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। আমার সেবার জন্য পিতা যে খাদেম নিয়োগ করেছিলেন তাকে বলা হলো একে উঠাও (অল্প বয়স্ক ছিল) আর সেই সময় অধম কিছুটা অসুস্থও ছিল, সেই খাদেম আমাকে তুলে নেয় এরপর তারা খুবই বিরত্বের সাথে সেই হট্টগোলকারী জনতার মোকাবিলা করে। মোকাবিলার ফলে হট্টগোলকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এদেরকে যেতে দাও।

তিনি লিখেন, একবার আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার সঙ্গী ছিলাম। হুযূর (আ.) ঘরে অবস্থান করছিলেন। যাবার বেলায় একস্থানে কাগজ, কলম এবং দোয়াত রাখা ছিল যেন কিছু লিখছিলেন। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মেয়ের নাম রাখার অনুরোধ করলে তিনি (আ.) আমেনা বেগম প্রস্তাব করেন। তার আরেকটি বর্ণনা আছে, বাল্যকালে অধম যখনই পিতার সঙ্গী হয়ে কাদিয়ান আসতাম, শিশুসূলভ অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ক্লিনিকে চলে যেতাম, যেখানে বসে তিনি রোগী দেখতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমাকে তাঁর কোলে তুলে নিতেন আর আদর করতেন। তিনি (রা.) বেশিরভাগ সময়ই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং শিশুদের পড়াতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) শিশুদেরকে কোলে তুলে নিতেন। যখন কোন রোগী না থাকতো তখন তিনি কুরআন শরীফ পাঠ করতেন এবং শিশুদের পড়াতেন। আর যখন এখান থেকে উঠে অধম মসজিদ মোবারকে যেতো সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দর্শনের সুযোগ হত, হযরত (আ.) তাঁর নিজের কাছে আমাকে বসিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। সেই সময় কয়েকজন অতিথির মাধ্যমেই

মসজিদ মোবারকের শোভা বর্ধন হতো। কাদিয়ান খুবই ছোট্ট একটি গ্রাম ছিল। এটি ভাবাই যেতো না যে, হুযূর (আ.)-এর ইলহাম এমন মহিমার সাথে পূর্ণ হবে। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হুযূর (আ.)-এর পরম ভক্ত ছিলেন এবং পুরনো সেবকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সম্পর্কে বলতেন, তাঁর সময় বিজয় এবং ঐশী সাহায্যের সংবাদ আমরা আমাদের সামনে পুরো হতে দেখি। অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.) আগেই যা বলে দিয়েছিলেন, তাঁর (আ.) সেসব কথার প্রতি বিশ্বাস ছিল এবং তাঁর যেসব ইলহাম ছিল তার প্রতি বিশ্বাসের কারণে এটি বলতেন, এসব কথা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আবার বলতেন, আমরা তা পূর্ণ হতে দেখেছি।

অতএব এমনই ছিলেন সাহাবাগণ! যাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন এনে খোদা তা'লার সাথে সুসম্পর্ক গড়েছেন এবং তাঁর (আ.) প্রতি ঈমানে এমনই দৃঢ় ছিলেন যে, এই বিশ্বাস থেকে কেউ তাঁদেরকে সামান্য পরিমানও টলাতে পারতো না। ধর্মীয় আত্মাভিমানের ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ প্রাথমিক যুগের (সাহাবীদের) আদর্শকে স্মরণ করায়। তাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কথাকে ধারণ করেন এবং এর বুৎপত্তি লাভ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'খোদা তা'লার এই জামাত প্রতিষ্ঠা এবং এর সমর্থনে শত শত নিদর্শন প্রকাশের পিছনে উদ্দেশ্য হলো, এই জামাত যেন সাহাবাদের জামাতে পরিণত হয় এবং পুনরায় যেন সর্বোত্তম যুগ এসে যায়। যারা এই জামাতে প্রবেশ করে, তারা যেহেতু وَآخَرِينَ مِنْهُمْ -এ অন্তর্ভূক্ত হয় তাই তাদের, বাজে কার্যকলাপের বেশভূষা পরিহার করে নিজেদের পুরো মনোযোগ খোদা তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করা উচিত'।**

যেভাবে আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবারা তাঁর (আ.) এই শিক্ষা ও আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন যাতে আমরাও নিজেদের ভেতর পবিত্র পরিবর্তনের ধারা অব্যহত রাখার এবং তা প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হই।

ইনশাআল্লাহ্ পরশু থেকে বরং আগামীকাল রাত বারোটা থেকে নববর্ষও শুরু হচ্ছে। এ বছরটিও পূর্বের তুলনায় জামাতের জন্য অনেক বেশি বরকত ও কল্যাণ বয়ে আনবে আল্লাহ্‌র কাছে এটিই আমার প্রত্যাশা। জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধবাদীদের হাত আল্লাহ্ তা'লা প্রতিহত করুন এবং তাদেরকে সত্য উপলব্ধি সুযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'লা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেক আহমদী এবং পুরো জামাতের উপর অশেষ কৃপা বর্ষণ করুন আমীন।

নামাযের পর আজ আমি একটি গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব যা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তানের অডিটর— মুকাররম জামাল উদ্দিন সাহেবের। মুকাররম জামাল উদ্দিন সাহেব ১৯৩৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। ১৮ বছর বয়স থেকেই তিনি জামাতের সেবা আরম্ভ করেন। গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১১, রোজ মঙ্গলবার ৭৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

আল্লাহ্‌র ফযলে তিনি মূসী ছিলেন। রাবওয়ার বেহেশ্‌তি মাকবেরায় তিনি সমাহিত হন। দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সময় জামাতের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। যার মধ্যে জায়েদাদ (সম্পত্তি) বিভাগ, ওসীয়্যত দপ্তর, দারুয্ যিয়াফত, প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের অফিস, নাযারত খিদমতে দরবেশান অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এরপর ২০০৩ সালের জুলাই মাসে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া অডিটর

হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে জামাতের সেবা করে গেছেন। তিনি ২০০৮ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত মোহাসেব ও প্রভিডেন্ট ফান্ড শাখার কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মরহুম স্বল্পভাষী, সাদাসিধে জীবন যাপনকারী পবিত্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। অধিনস্থ কর্মচারীদের সাথেও অত্যন্ত দয়াসূলভ ব্যবহার করতেন। সবার সাথে সহানভূতি ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। আত্মীয়-স্বজন এবং স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সর্বদা সৌহার্দ্যপূর্ণ ও উত্তম ব্যবহার করতেন। খোদার কৃপায় তিনি নির্ভিক ও সৎসাহসের অধিকারী ছিলেন। নামায, রোযা এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। যুগ খলীফার সাথে তার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্‌র ফযলে নিজের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনেক আন্তরিক ছিলেন এবং কখনো আলস্য দেখাতেন না। জামাতের কাজকে সব সময় নিজের ব্যক্তিগত কাজের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সত্যিকার ওয়াকফে যিন্দেগীর চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সব সময় নিষ্ঠা, বিনয় ও নম্রতার সাথে কাজ করতেন। যখন যেই অফিসারই ছিলেন তিনি সব সম নিজের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পূর্ণ আনুগত্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন, তাঁর প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন। মরহুমের সন্তানদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল এবং সাহস দিন। তাঁর স্ত্রী পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। তিনি তাদেরকে (মরহুমের সন্তানদেরকে) তাঁর নেক গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন, আমীন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)